নিজেই নিজের সঙ্গে থাকি (একটি সাক্ষাৎকার)

মণীন্দ্র গুপ্ত

সন্দীপ— আপনার বাড়িতে অনেকদিন, সেই ছিয়াত্তর সাল থেকে, আসছি। তখন থেকেই লক্ষ করেছি কোন চিত্রকর্ম — যে রকম অন্য কবিদের বাড়িতে দেখি— বা প্রিয় মনীষীর ছবি— নেই। পরিবর্তে রামকৃষ্ণদেবের ছবি। এছাড়াও আমার এক বন্ধুকে একবার বলেছিলেন কবিদের 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়লে উপকৃত হবার সম্ভাবনা আছে। উৎসের দিক থেকে। এ বিষয়টি যদি একটু বিশদ করে বলেন।

মণীন্দ্র - ছবি আমার ভালবাসার জিনিস। নিজের মনে ভালো ছবির প্রিন্ট দেখে দেখে সেই ছোটবেলা থেকেই আমি রঙ রেখা আকার ও কল্পনার দেশে বহু সময় কাটিয়েছি। উৎকৃষ্ট ছবির প্রিন্ট ও অ্যালবাম সংগ্রহ করা ছিল আমার প্যাশন। তখন সস্তাও ছিল ওসব। কিন্তু কখনও ইচ্ছে হয় নি ছবি বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙাই। ছবি তো ঘরের আসবাব নয়। তাছাড়া একটি ছবি ক্রমাগত দেখলে তার রহস্য ও প্রগাঢ়তা চলে যায়, ঘরের মানুষেদের নিঃশ্বাস মান অভিমানের আড়ালে পড়ে সে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এই ম্লানতা এড়াবার জন্য অবশ্য মাঝে মাঝে জাপানী স্টাইলে ছবি পাল্টে দেওয়া যায়। কিন্তু কি দরকার।

ঘরে মনীষীদের ছবি টাঙাবার আমি কোনো যুক্তি বা প্রেরণা খুঁজে পাই না। মণীষীদের ছবি দেখে হৃদয়, মন বা আদর্শপালনের কোনো তৃপ্তি অনুভব করি না। তাছাড়া, যখন ভালো করেই জানি মহাপুরুষদের চেলা হবার বিন্দুমাত্র যোগ্যতা আমার নেই তখন কেনই -বা ছবি টাঙিয়ে আগুন্তুকদের মনে একটা প্রতারক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করি।

শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি টাঙাবার কারণটা কিন্তু একেবারেই আলাদা। লক্ষ্য কর তাঁর মাথার উপরার্ধ কি রকম সুগঠন বৃত্ত, লক্ষ কর তাঁর দু চোখের ঢাল কি রকম বাইরের দিকে নামানো। যেন পাতলা ধুলোর স্তরে ঢাকা মূর্তি, তবু কেমন আভাময়। কিন্তু এসবও নয়। মনে হয়, বাড়িতে যেন কেউ অভিভাবক আছেন। মা বাবার মতো কবিদের বাছবিচার না করে যেমন ইচ্ছে, সব রকম বই পড়া উচিৎ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অবশ্যই। আমাদের ভিতরের গ্রন্থি, বাইরের বন্ধনের স্বরূপ চিনিয়ে দেয় এই বই— মুক্তির বিচিত্র পথগুলির আশ্চর্য অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। এই বই জগৎ ও জীবনের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয় সর্বদ্রষ্টার মতো দেখতে দেখতে চলে যেতে পারে উৎসের মূলে, সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বা প্রলয়ের অকরহীন কালহীন অবস্থায়। কঠিনতম বিষয় নিয়ে এমন অমোঘ ও অব্যর্থ কথাবার্তা আর কোন্ বইয়ে আছে ; সত্য ও মায়া, বাস্তব ও অধিবাস্তব, ব্যক্ত ও অব্যক্ত জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে এমন উদ্ভাসন আর কোথায় আছে। এসব কবিদের জ্ঞাতব্য। এই দিক থেকেই আমি কথামৃতের উল্লেখ করেছিলাম।

সন্দীপ— রামকৃষ্ণ কথামৃতের একটা চিরকালীন বাঙালিত্ব, আঁকাড়া বাঙালি স্বভাবের ব্যাপার আছে, সে জন্যেই কি এই বইটি কবিদের পক্ষে জরুরি বলে আপনার মনে হয়?

মণীন্দ্র— কথামৃতের মধ্যে চিরকালীন বাঙালিত্ব অবশ্যই আছে। ভারতীয়ত্বও আছে। নিখিল মানুষের আধ্যাত্মিক ও অভিজ্ঞতার সারাৎসারও আছে। একজন মানুষ যিনি সমস্ত অজ্ঞেয়, সমস্ত রহস্য ভেদ করতে চেয়েছিলেন তাঁর পথচলার রোমহর্ষক কাহিনি রয়ে গেছে এই বইয়ে। অতএব নানা দিক থেকেই আমি বইটিকে কবিদের পক্ষে জরুরি মনে করেছি। জরুরি, কিন্তু কোনোক্রমেই একমাত্র নয়।

সন্দীপ— আপনার কিছু কবিতা পড়তে পড়তে উৎস হিসেবে রামকৃষ্ণ কথামৃত-র গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। যেমন 'একটু বাড়ির জন্য'।

মণীন্দ্র— 'একটু বাড়ির জন্য' কবিতাটির পিছনে রামকৃষ্ণ কথামৃত ছিল না। কবিতাটি এসেছিল গৃহহীন হবার বিপন্নতার বোধ থেকে। চিরপ্রবাসে এই কলকাতা শহরে আমরা যারা ভাড়াটে বাড়িতে থাকি, নানা উপলক্ষে তাদের আশ্রয়চ্যুত হবার ভয় এসে চেপে ধরতে পারে। সেই উদ্বিগ্ন, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে কলকাতা, তার হাইরাইজ বাড়িগুলো, তার যক্ষরক্ষদের বাড়িতে বাড়িতে আকীর্ণ স্কাইলাইন অন্য মাত্রা নিয়ে দেখা দেয়, তখন পালাবার জন্য ছেলেবেলাকে মনে পড়ে— পানায় ছাওয়া ডোবার প্রাচীন জলে যেন সেই অতীত এখনো মাছ আর ভূত বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছে। এইভাবে পালিয়ে, পিছনে গিয়ে, অংশত বাঁচার কথা ভাবি। আবার ভাবি, ভবিষ্যতে কাল এবং শূন্য আমার হয়ে প্রতিশোধ নেবে। 'ঐসব অতিকায় গগণশূলের পিছে দেখি/শূন্য হাঁ করেছে। শূন্য ভয়ংকর শক্তিশালী' এটা হৃদয়হীন, মূঢ় এই সভ্যতার বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদে না, তার মৃত্যু সম্বন্ধে এ রকমই আমার স্থির বিশ্বাস। শেষে, মানুষের চিরদিনের নিশ্চিন্ত অন্য বাসগৃহ দেখতে পাই:

ছাগল তাড়িয়ে বুড়ী বাড়ি ফিরচে। বুড়ীমার সঙ্গ ধরি—
মাঠে ঘেসোড়া কেমন শুয়ে আছে হিরণ পাথরে, গাঢ় ঘুমে...
যেতে যেতে...এই জঙ্গলমহলে, হরিণের তাঁবুর দরজা থেকে দেখা
যায়/ করুণাময়ের ভাঙা চাঁদ।

হরিণের তাঁবু—এটা কিন্তু কোনো কাব্যিক কথা নয়। শিকারিদের কাছে শুনেছি, আসামের জঙ্গলে, খুব উঁচু ঘাসের বনে হরিণেরা দুপুরে বিশ্রাম নেবার জন্য ঘাসের তাঁবু তৈরি করে। কি করে যেন ওরা ঘাসগুলোর মাথা একত্র করে চুলের ঝুঁটির মতো একটা ফাঁস লাগিয়ে আটকে দেয়। তারপর ভিতরের দিকের ঘাস খেয়ে পরিস্কার একটি বিশ্রামের শঙ্কুর আকারের তাঁবু বানায়। ছোট দরজাটি গিয়ে ঢুকে রোদে বিশ্রাম নেয়। এ ব্যাপারটা যদি না জানতাম তবে এই লাইনগুলো লিখতে পারতাম না। তাহলে দ্যাখো, কিভাবে সব রকম ইনফরমেশন, সব রকম অভিজ্ঞতা কবিতার কাজে আসে।

সন্দীপ— আপনার কবিতার একটি স্তরে প্র্যাতহিক— সাংসারিক জীবন, তার পরই সেই স্তরটি থেকে উঠে যায় কবিতা একটা অলৌকিক— যেন Super realist যাদু, রূপকথা, অকাল্ট, কল্পবিজ্ঞান ইত্যাদির জগৎ থেকে নেওয়া অলৌকিক - লৌকিক মেলানো স্তরে। আবার নেপথ্যে কাজ করেছে বরিশালের বালকজীবন। 'অক্ষয় মালবেরী'তে এই জীবনের কথা বলেছেন। লৌকিক যে অলৌকিক মিলছে এ রকম কি আপনার মনে হয়েছে?

মণীন্দ্র — অক্ষয় মালবেরীর প্রসঙ্গ আপাতত আনছি না। সে আমার ছেলেবেলার কথা। অবশ্যই আমার এই জীবনের পশ্চাৎপটে রয়ে গেছে আমার সেই বাল্যকাল, অভ্রান্তভাবে।

আমার কবিতায় তুমি যে দুটি স্তরের কথা বলবে সে সম্বন্ধে আমি তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু দ্বিস্তর এই জগৎ সম্বন্ধে আমার ধারণাটা একটু বুঝিয়ে তোমাকে বলি। আমার অনেক দিন ধরে মনে হয়েছে এই যে আমরা চোখের সামনে জগতের দৃশ্যমান, ঘটনা স্তর দেখছি এরই সমান্তরালে জগতের আর একটি স্তর সমানভাবে বয়ে চলেছে। সে স্তরটি আমরা দেখতে পাই না— কিন্তু মধ্যে মধ্যেই তার ক্রিয়া এসে আমাদের নিশ্ছিদ্র বাস্তবতার উপরে সাপটা পড়ে থাকে কিছুক্ষণের জন্য ব্যাখ্যার অতীত করে চলে যায়। যতক্ষণ স্তর দুটো একটু ফাঁক রেখে সমান্তরাল চলেছে ততক্ষণে হয়তো কিছু স্থূলভাবে অনুভব করি না। কিন্তু যখন স্তর দুটি কোনো অজ্ঞাত আলোড়নে কনভেক্স ও কনকেভ হয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করে তখন অপ্রাকৃত একটা কিছু ঘটে। 'নমঃ শিবায়' বলে একটা কবিতায় এই ব্যাপারটা একটু

বলতে চেয়েছি: কোনো ট্রাক ড্রাইভার রাতের বম্বে রোড ধরে বেশ স্থির গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল। দুর্ঘটনার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। কিন্তু...

'মাঝে মাঝে পথে সুলগনে যদি আকাশ ও পৃথিবীর
পার্থিব ও অপার্থিব স্তর দুট খুব কাছে আসে
নৈসর্গিক আলোড়নে গাড়ি উল্‌টে যায়—'

মনে হয়, স্বাভাবিক মৃত্যুর সময়ও —সঠিক শেষনিঃশ্বাস ফেলার মুহূর্তে ওই দুটিস্তর বেঁকে এসে পরস্পরকে স্পর্শ করে পরমুহূর্তেই আবার সমান্তরাল হয়ে যায়। শুধু মৃত্যু নয়, যুবক - যুবতীদের প্রথম চুম্বনের সময়ও বোধ হয় এই স্তর দুটি ক্ষণমুহূর্তের জন্য পরস্পরকে ছুঁয়ে ফেলে।

সন্দীপ— আপনি কি এক্ষেত্রে সিম্বলিস্ট কবি, বিশেষত ইয়েটসের কাছ থেকে উপাদান পেয়েছেন? স্বজ্ঞার বিষয়ে?

মণীন্দ্র— না, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত স্তরের সংস্পর্শের কথা কোনো কবির কাছ থেকে পেয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না। বরং হয়তো কোনো সাধকের অতীন্দ্রিয় কিংবা তুরীয় জগৎ সম্পর্কে নানা কথাবার্তা ওই আশ্চর্য স্তরের দিকে আমার চিন্তাকে আকর্ষণ করেছিল। এখানে বলে রাখা দরকার—এ বিষয়ে আমার কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, সমস্তটাই চিন্তা, কল্পনা ও বিশ্বাস নির্ভর।

সন্দীপ— আসলে, বিজ্ঞানী বা মণীষীরা জগৎকে explore করেন। তাই আপনি তাঁদের জীবনী বা তাঁদের সম্পর্কিত গ্রন্থ পাঠে উৎসাহী?

মণীন্দ্র— হ্যাঁ, ওঁরা জগৎকে, এক্সপ্লোরও করেন, এক্সপ্লেনও করেন। ওঁদের আবিস্কার, ওঁদের সিদ্ধান্ত এই মূর্খকে জাগায়।

সন্দীপ — এ দিক থেকে রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী ও শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার একটি মিল আছে। নয়?

মণীন্দ্র—তোমার কি তাই মনে হচ্ছে? রমেনবাবুর সঙ্গে আমার কোনো তুলনা চলে না। উনি অনেক বড়ো কবি। শম্ভুনাথের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, উনিও জগৎ নিয়ে ভাবেন, বিস্মিত হন। তাঁর কবিতায় জগতের মানচিত্র বর্ণবহুল, প্রাণবন্ত চলচ্ছবি হয়ে ধরা দেয়। মাঝে মাঝে প্রকৃতির দৃশ্যের সঙ্গে মানবমনের প্রতিতুলনা আসে। আমার কবিতা কি তেমন?

সন্দীপ— আপনার কবিতায় ছবি আছে। তবে আপনি যাকে চির বস্তু বলেন সেই চির বস্তু বা আদিপ্রতিমা নির্মাণে আপনার যেমন আনন্দ।

মণীন্দ্র— হ্যাঁ, ছবি আমার কবিতাতেও আছে। চোখ মেলা শিশুর কাছে জগৎ প্রথম ছবি হয়েই তো প্রকাশ পায়। প্রথম দিকে কিছু একটা ভাবলে তার জাজ্জ্বল্যমান ছবি দেখতে পেতাম। ক্রমশ ছবির সঙ্গে মানে মিশে যায়, আবেগ মিশে যায়, শান্তির ছায়া আর উদাসীনতা মিশে যায়। সমস্ত পৃথিবী তার রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের ভান্ডার নিয়ে অপেক্ষা করে আছে—আমি প্রয়োজন মতো কবিতার জন্য যা যা দরকার নিই। কিন্তু তার পরেও তো কিছু বাকি থেকে যায়।

সন্দীপ— আচ্ছা, এ দিক থেকে আপনার কবিতাকে সুররিয়ালিস্ট প্রভাবিত বললে, কি মেনে নেবেন?

মণীন্দ্র — আমার কবিতা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, আজ হয়তো আর সেখানে নেই। সুতরাং কোনো রকম লেবেল আঁটা বোধ হয় উচিত হবে না।

আমি শুধু নিজস্ব জগৎটাকে প্রকাশ করতে চেয়েছি—তার জাত গোত্র নিয়ে কোনো ভাবনা তো মনে ছিল না।

সন্দীপ— আচ্ছা, একটু অন্যদিকে গিয়ে—ছবির দিক থেকে একটা জিজ্ঞাসা আছে। আপনি বারংবারই বলেন, যামিনী রায় আপনার প্রিয় নন। আপনার প্রিয় অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের তুলনায় ব্লেকের ছবিই কি কবি হিসেবে আপনার বেশি প্রিয় হওয়া উচিত ছিল না? রহস্যময়তার দিক থেকে?

মণীন্দ্র— ব্লেকের ছবি যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে, ব্লেক রহস্যের ছবি (ইলাস্টেশন) এঁকেছেন, কিন্তু তাঁর ছবিতে তেমন রহস্য নেই। তাঁর চেয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে অনেক বেশি রহস্য। যামিনী রায় আমার প্রিয় নন। ভাবতে পারি না, কোনো চিত্রী একই ছবি হুবহু একশোটা আঁকেন, এবং সবকটাতেই নাম সই করেন। নন্দলালের মধ্যে ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানশিপ আছে, অভ্রান্ত নন তিনি, তবু তাঁর ছিল এক আত্মস্থ রূপদৃষ্টি। শেষের দিকের কালিকলমের কাজ, ছোপের কাজ দেখে আমার কথা মিলিয়ে নিয়ো। নন্দলালের পরে দৈনন্দিন জীবনকে এমন শ্রদ্ধাভরে এমন মমতাভরে কাউকে তো আঁকতে দেখলাম না। অবনীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন—এটাই যেন তার অপরাধ। এখন সবাই ওই কথাটা সশব্দে বলে তাঁর স্বকীয় প্রতিভা সম্বন্ধে নিঃশব্দ থাকেন। আমি কিন্তু, বাস্তব পৃথিবী যে আসলে রূপকথার দেশ, এটা অবনীন্দ্রনাথের ছবি না দেখলে এমন করে বুঝতে পারতাম না।

সন্দীপ — সেই 'আমরা তিনজন' বইটি প্রকাশিত হবার অনেক কাল পরে আপনার 'নীল পাথরের আকাশ' প্রকাশিত হল। আপনার কবিতায় এই ব্রেক থ্রু কিভাবে হল, যে তরুণ কবিরা আপনার কবিতার একান্ত অনুরাগী হলেন।

মণীন্দ্র— আমি বুড়ো মানুষ, কিন্তু তবু তোমাদের চেয়ে কত বড়ো? তিরিশ? চল্লিশ? আসলে বয়সের সঙ্গে আমাদের ফ্যাকাল্টিগুলোই কমে যায়, আর কিছুই ফুরোয় না। পৃথিবী ফুরোয় না, আমাদের নেবার ইচ্ছে, পাবার ইচ্ছে ফুরোয় না। মারা যাবার দিনও মনে হবে, আমি অপূর্ণ। আরো কিছু দিন বাঁচলে আরও ভরিয়ে নিতে পারতাম নিজেকে। এই অপূর্ণতার জন্যেই বোধ হয় তোমরা আমার সঙ্গে মিল খুঁজে পাও।

সন্দীপ— আপনার জীবনের আধুনিক যাপন কি কবিতার আধুনিকতাকে সম্ভব করেছে?

মণীন্দ্র— আমার জীবনযাপনে কি আধুনিকতা আছে? জানি না। খানিকটা সংস্কারহীনতা আছে। সমাজের কিছু রীতিনীতি অর্থহীন মনে হয়। এই মনোভাব থেকেই কবিতার কোনো পূর্বসংস্কার আমি স্বীকার করতে চাই নি। সম্ভবত এই মুক্তিকেই তুমি অ্যাপ্রিশিয়েট করছো।

সন্দীপ ঃ এই যে আপনার কবিতার মধ্যে নতুন স্বর, এটা বহুদিন নিজের কালের কবিতা থেকে একটু দূরে থাকার জন্য?

মণীন্দ্র — কি জানি। হয়তো তাই। অসামাজিক হওয়ার ফলে হয়তো আমার ধ্যান - ধারণা অন্য রকম ছিল, অন্য রকম থেকে গেছে।

সন্দীপ— প্রথম দিকে আপনি একা একা কথা বলেছেন। একার কবিতা। বিশেষ করে 'রাত্রিতরঙ্গ'। এখানেও বাস্তব, তারপর আবার কল্পনা। আবার নেমে এলেন বাস্তবে।

মণীন্দ্র— 'রাত্রিতরঙ্গ' কবিতাটা নিঃসঙ্গতার কবিতা। ঐ নিঃসঙ্গতা ছিল বাস্তব। কথাগুলোও কোনোটাই মিথ্যে নয়। আমি শুধু উপমা দিয়ে দিয়ে, উপস্থাপনা করে করে, সন্ধে থেকে একজন নিঃসঙ্গের রাত্রিটিকে ধরে দিতে চেয়েছি।

এর পরেই আমাদের কথাবার্তা আর বিশেষ এগোয়নি। অনেকক্ষণ কথা বলার ফলে মনীন্দ্র দা, সন্দীপ মুখোপাধ্যায় প্রশান্ত আমরা সকলেই একটু ক্লান্ত বোধ করছিলাম। আমার আঙ্গুলেও রক্ত জমে উঠছে লিখতে লিখতে। তাহলে এবার ওঠার পালা। বনগাঁ লোকাল ডাকছে।